চমৎকার! পরা যাক দু একটি মাউস এবার... গুরুচণ্ডা৯
www.guruchandali.com

ইকোলজিভিত্তিক কৃষিবিজ্ঞান ও খাদ্য সুরক্ষার জন্য লোকায়ত শস্যবৈচিত্র্যের গুরুত্ব

ডঃ দেবল দেব লেখকের গ্রাহক হোন

আলোচনা | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১৫ এপ্রিল ২০২০ | ৫১৪৪ বার পঠিত

মূল প্রবন্ধ ২৬শে অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সায়েন্স নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত।
মূল ইংরেজি প্রবন্ধ থেকে বাংলায় ভাষান্তরঃ **স্বর্ণেন্দু শীল**

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আয়লা পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন বদ্বীপগুলোতে আছড়ে পড়ে ২০০৯ এর ২৫শে মে। খাঁড়ির জল বেড়ে গ্রামে ঢুকে এসে গ্রাম ধ্বংস করে, ফুলেফেঁপে ওঠা নদী বাড়িঘর গ্রাস করে, ঢেউয়ে ভেসে যায় জীবন-জীবিকা-সম্পত্তি -- পড়ে থাকে হঠাৎ নোনা হয়ে যাওয়া ফাঁকা ক্ষেত। বেশিরভাগ পুকুর আর নলকূপের জলও রাতারাতি নোনতা হয়ে যায়।

আয়লার ধ্বংসলীলার পর থেকে নোনা-সহনশীল ধানের বীজের জন্য পাগলের মত খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, যা এই সুন্দরবনের চাষীদেরই পূর্বপুরুষরা একসময় তৈরি করেছিলেন। কৃষির আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত ফসলের উত্তরাধিকারও হারিয়ে গিয়েছে চাষীদের হাত থেকে।

কিন্তু এখন, কয়েক দশকের আত্মসন্তুষ্টির পর, কৃষিবিশেষজ্ঞ ও চাষী, উভয়েই ঝাঁকি খেয়ে এই তথ্যের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়েছেন যে সুন্দরবনের নোনা মাটিতে "আদিম"[১] সাবেকি ধানের জাতগুলোর তুলনায় আধুনিক উচ্চফলনশীল জাতের ধানরা দাঁড়াতেই পারবে না। কিন্তু সেই সমস্ত নানান বৈচিত্র্যের নোনা-সহনশীল জাতের বীজই এখন আর পাওয়া যায় না, একটা কি দুটো এরকম জাতের ধান এখনও টিকে আছে, কিছু গরীব চাষীর প্রান্তিক কিছু ক্ষেতে, যাঁরা এখন নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছেন। সরকারের ধানের জিন ব্যাঙ্কের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে তাঁরা এই সমস্ত ধানের জাতগুলোকে সংরক্ষণ করেছিলেন, অথচ এখন দরকারে চাষীদের কাজে লাগার মত বীজের যোগান দিতে তাঁরা পারছেন না। কেন্দ্রীভূত এক্স সিটু (ক্ষেত-বহির্ভূত) জিন ব্যাঙ্কের করুণ পরিণতি এইটাই, ক্রমশ সেগুলো পরিণত হয় বস্তুত দীর্ঘদিনের অব্যবহারে মরে-হেজে যাওয়া বীজের মুর্দাঘরে।

এইসমস্ত নোনা-সহনশীল জাতের ইন সিটু (ক্ষেতস্থ) সংরক্ষণ করে আসা বীজ ব্যাঙ্ক ভারতে একমাত্র 'ব্রীহি' (http://cintdis.org/vrihi), যা সুন্দরবনের এক ডজন চাষীকে অল্প পরিমাণে চার চারটে নুন-সহনক্ষম জাতের ধান বিলি করেছে। নোনা ক্ষেতে এইসমস্ত দেশি জাতের ধানের সাফল্য প্রমাণ করে দিয়েছে কিভাবে দেশীয় ফসলের জিনবৈচিত্র্য স্থানীয় খাদ্যসুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারে। চাষে বাইরে থেকে আনুষঙ্গিক রাসায়নিকের দরকার হয় না বলে এইসমস্ত দেশি জাত সুস্থায়ী কৃষির[২] লক্ষ্যেরও সহায়ক।

সাবেকি জাতের ধান, আমাদের সেরা বাজি

শুধু উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের জমির লবণাক্ততাই নয়, এ বছর (২০০৯ সালে) দেরিতে বর্ষা আসার জন্যেও সমস্ত সেচহীন জমিতে আধুনিক জাতের ধানের বীজতলা শুকিয়ে মরেছে ও গোটা উপমহাদেশ জুড়ে প্রান্তিক চাষিদের খাদ্য সুরক্ষা বিপন্ন করে তুলেছে। বহুল প্রচারিত সবুজ বিপ্লবের ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও এখনো দক্ষিণ এশিয়ার শস্য উৎপাদন প্রায় সবটাই বর্ষার ওপর নির্ভরশীল এবং বর্ষার বড্ড দেরিতে আসা, খুব আগে আসা কিম্বা খুব অল্প বর্ষা, যেকোনোটাতেই আধুনিক জাতের শস্যের ফলন অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায়। ভারতের ষাট শতাংশ কৃষিজমি সেচহীন এবং সম্পূর্ণত বর্ষার ওপর নির্ভরশীল।

২০০২ সালে জুলাইয়ের অল্পবৃষ্টিতে মরশুমি বৃষ্টিপাতের ১৯ শতাংশ ঘাটতি হয় ও এর ফলে শস্য উৎপাদনের প্রভূত ক্ষতি হয় ও ভারতের জিডিপির ৩ শতাংশ হ্রাস পায় [Challinor et al. 2006]। ২০০৯ সালে বৃষ্টিপাতের ঘাটতির ফলে মরসুমের শুরুতে ১০ কোটি টন মোট উৎপাদনের ভবিষ্যৎবাণীর থেকে প্রায় ১ থেকে ১.৫ কোটি টনের ঘাটতির আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে [Chameides 2009]। এই ঘাটতি ৪৩ কোটি টনের বিশ্বব্যাপী চাল উৎপাদনের সম্ভাব্য মাত্রার ৩ শতাংশ।

জলবায়ুর এই খামখেয়ালীপনার উল্টোদিকে আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ব্যবহার করতে চায় অভিযোজনের জন্য জিন - যেগুলোকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের দেশের প্রজননবিদ-কৃষকরা যত্ন নিয়ে নির্বাচন করেছেন বহু শতাব্দী আগে। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার তারতম্য সহ্য করা ও নানারকম শত্রুপোকা ও রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে কৃষকদের নির্বাচন জন্ম দিয়েছিল হাজার হাজার আঞ্চলিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো ধানের সাবেকি নানান জাত (এদেরকে ইংরেজিতে ল্যান্ডরেসও বলা হয়[৩])। বর্তমানে এই সমস্ত জাতের বেশিরভাগের বদলে চাষ করা হয় অল্প কিছু আধুনিক জাতের ধান, যা খাদ্য সুরক্ষাকে বিপন্ন করে তুলছে।

ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লবের আগে অবধি, ভারতে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার জাতের ধান চাষ হত বলে মনে করা হয় [Riccharia and Govindasamy 199 বেশিরভাগ আজ ক্ষেত থেকে বিলুপ্ত। হয়ত কয়েক হাজার জাতের সাবেকি ধান এখনও টিকে আছে কিছু প্রান্তিক জমিতে, যেখানে কোন আধুনিক জাতের ধানই [illegible] অসম্ভব। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলায় প্রায় ৫৬০০ জাতের ধান চাষ হত, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৩র মধ্যে প্রায় ৩৫০০ জাতকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফিলিপিন্সের

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা সংস্থায় (আই আর আর আই; IRRI) [Deb 2005]। গত চোদ্দ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ ও আশেপাশের কিছু অঙ্গরাজ্যে বিস্তর খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও আমি নানান প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক ক্ষেত থেকে মাত্র ৬১০টা সাবেকি জাতের ধান পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। বাদবাকি প্রায় ৫০০০ জাত চিরকালের মত হারিয়ে গেছে চাষের জমি থেকে। বেঁচে থাকা এই ৬১০ টা ধানের জাত এখন প্রতি বছর আমার ধান সংরক্ষণ খামার 'বসুধা'য় (http://cintdis.org/basudha) চাষ হয়। প্রতি বছর ব্রীহি বীজ ব্যাঙ্ক থেকে বিনামূল্যে এগুলোর বীজ ইচ্ছুক চাষিদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

'ব্রীহি' (সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ "বোনা ধান") ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি ধানবীজ সঞ্চয়াগার। ব্রীহিতে সংরক্ষিত ধানের জাতগুলো, যেকোন আধুনিক জাতের তুলনায় অনেক বেশী তাপমাত্রা ও মাটিতে পুষ্টি-উপাদানের তারতম্য সহ্য করতে পারে, জলাধিক্য বা জলাভাব সহনক্ষমতাও এদের বেশী। এ বছরের বর্ষা অনেক দেরিতে আসলেও এদের বেঁচে থাকা ও ফলনের উল্লেখযোগ্য হেরফের হয় নি, কয়েক বছর আগের অতিবৃষ্টিতেও হয় নি।

হারিয়ে যাওয়ার কার্যকারণ

যদি সাবেকি জাতগুলো এতই কাজের, তাহলে চাষীরা সেগুলোকে হারিয়ে ফেলল কেন? এর গতিপ্রক্রিয়া জটিল হলেও বোঝা শক্ত নয়। যখন বীজ কোম্পানীগুলো আর সরকারী সংস্থারা 'চমৎকারী বীজ'-এর প্রচার ও প্রসার শুরু করে, বহু চাষী তাতে আকৃষ্ট হয়ে টোপ গেলেন ও নিজেদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জাতগুলোকে বিসর্জন দেন। চাষীরা অত্যধিক রাসায়নিকে সাড়া দেওয়া জাতগুলোর প্রথম দিকের আদর্শ পরিবেশে ফলন দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের 'সফল' প্রতিবেশীদের অনুকরণে এগুলো চাষ করতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বেশিরভাগ চাষীই এই সমস্ত 'সবুজ বিপ্লব' বীজ চাষ করতে থাকেন, এবং সবুজ বিপ্লবে যোগদান না করা চাষীদেরকে পিছিয়ে পড়া, অনাধুনিক-মনস্ক ও অপরিণামদর্শী বলে দাগিয়ে দেওয়া শুরু হয়ে যায়। বীজ কোম্পানীরা, রাজ্য কৃষি দপ্তরগুলো, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ডেভেলপমেন্ট এনজিওরা চাষীদের আবেদন জানাতে থাকে তাঁদের সাবেকি বীজ ও সাবেকি চাষ-পদ্ধতি, কৃষির হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার, দুটোই বিসর্জন দেওয়ার জন্য। কয়েক বছরের অব্যবহারে সাবেকি বীজগুলো আর ব্যবহারের উপযোগী থাকে না এবং ফলত হারিয়ে যেতে থাকে। তাই অসুবিধেজনক পরিবেশগত পরিস্থিতিতে যখন আধুনিক জাতের ফলন মার খেতে থাকে, ততদিনে চাষীদের আর কোথাও যাওয়ার রাস্তা থাকে না। একমাত্র উপায় ছিল ক্রমশ জমিতে জল ও কৃষিরাসায়নিকের ব্যবহার বাড়িয়ে যাওয়া এবং এখনও তাইই। এই চলতে চলতে আধুনিক কৃষির ক্রমশ বাড়তে থাকা খরচ আরও আরও বাড়তে থাকা দেনার দায়ে চাষীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলতে থাকে। প্রায় এক শতাব্দী ধরে কৃষিবিশেষজ্ঞরা খাদ্য সুরক্ষার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিতে আস্থা রাখার ফলশ্রুতিতে, আজ কৃষিকাজ একটা ঝুঁকিবহুল পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে চাষীর দেনার দায় ক্রমশ বাড়তেই থাকে। ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত প্রায় দেড় লক্ষ চাষী আত্মহত্যা করেছেন [ভারত সরকার ২০০৭] আর এই সংখ্যা ২০০৭ অবধি বছরে গড়ে ১০,০০০ করে বেড়েই চলেছে [Posani 2009]।

সবুজ বিপ্লবের প্রথম দশকে স্বল্পফসলী জমিকে উচ্চফলনশীল করতে সরকার সেচ ও সারে পর্যাপ্ত ভর্তুকী দেয় ও ধানের উৎপাদন বেড়ে যায়। খুব তাড়াতাড়িই অবশ্য ধানের ফলন আবার পড়তে থাকে। সবুজ বিপ্লবের চল্লিশ বছর পর, ধানের বিঘা প্রতি ফলন আশঙ্কাজনক ভাবে কমছে [Pingali 1994]। আই আর আর আই এর নিজেদের সমীক্ষাতেই দেখা যাচ্ছে যে "মিরাকল ধানের জাত" আই আর ৮ এর চাষে ফলন দশ বছর ধরে ক্রমশ কমছে [Flinn et al 1982]. আজকে, শুধু জমিকে ফলনযোগ্য করে রাখতেই দক্ষিণ এশিয়ার চাষিদের ষাটের দশকের শেষের দিকে যা দিতে হত তার ১১ গুণের বেশি কৃত্রিম নাইট্রোজেন সার ও ১২.৮ গুণ বেশী ফসফরাস সার দিতে হয় [FAI 2008]। খাদ্যশস্যের ফলন আবার সবুজ বিপ্লবের আগের মাত্রায় ফেরত গেছে, অথচ প্রচুর চাষী মনেই করতে পারেন না যে আগে তাঁরা প্রতি একক ইনপুটে এখনকার তুলনায় বেশী ধান উৎপাদন করতেন। বেশিরভাগ চাষী সাবেকি জাতগুলোর গড় উৎপাদন ভুলেই গেছেন এবং বিশ্বাস করেন যে সাবেকি জাত নিম্ন-ফলনশীল। তাঁরা মনে করেন যে আধুনিক 'উচ্চ-ফলনশীল' জাতগুলোর উৎপাদন নিশ্চয়ই বেশী, নইলে তাদের এমন নাম হবে কেন?

এর উল্টোদিকে গত চোদ্দ বছর ধরে[ক] বসুধায় ৬১০টি[খ] সাবেকী জাতের ধানের ফলন - এবং কৃষিবিজ্ঞানের প্রচলিত নিরিখেই কৃতিত্বের নিদর্শন - চাষীদের বিশ্বাস করিয়েছে যে বহু সাবেকি জাতই যেকোন আধুনিক জাতদের ফলনের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে সক্ষম। এছাড়াও, জল ও কৃষিরাসায়নিক ইনপুটের ক্ষেত্রে যা বাঁচে আর বৃষ্টিপাতের খামখেয়ালীপনা সত্ত্বেও উৎপাদনের স্থিতিশীলতা রাসায়নিক কৃষির তুলনায় ইকোলজিভিত্তিক কৃষির অর্থনৈতিক সুবিধে সম্পর্কেও তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পেরেছে। ক্রমশই বেশী বেশী সংখ্যায় চাষীরা ব্রীহি বীজ ব্যাঙ্ক থেকে বীজ নিচ্ছেন ও অন্যান্য চাষিদের সাথে সেই বীজ বিনিময় করছেন। এ বছর[গ] ৬৮০ জনেরও বেশী[ঘ] চাষী ব্রীহি থেকে বীজ নিয়েছেন ও নিজেদের জমিতে চাষ করছেন। তাঁদের কেউই রাসায়নিক কৃষি কিম্বা সবুজ-বিপ্লবের জাতগুলোয় ফেরত যাননি।

অসামান্য উত্তরাধিকার

প্রতি বছর, চাষী-গবেষকরা আমাদের গবেষণা খামার বসুধায় সংরক্ষিত হওয়া প্রতিটি ধানের জাতের গঠনগত (morphological) ও কৃষিতাত্ত্বিক (agronomical) বৈশিষ্ট্য সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সাধারণ যন্ত্রপাতি - গ্রাফ পেপার, রুলার, মাপার ফিতে আর একটা বাঁশের মাইক্রোস্কোপ [Basu 2007]), এসবের সাহায্যেই গবেষকরা ধানের তিরিশটা নির্নায়ক বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করে রাখেন, যার মধ্যে পাতার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা, পাতা ও দুই গাঁটের মাঝের অংশের রঙ, সর্বোচ্চ পাতা কত ডিগ্রী কোণে বের হয়, ধানের শুঁয়ার[৪] রঙ ও মাপ, ধানের বীজের ও ঝাড়াই এর পরে দানার রঙ, আকৃতি ও মাপ, শীষে দানার সংখ্যা[৫], বীজের ওজন, ফুল আসার ও ধান পাকার সময়, গন্ধ আছে না নেই এবং বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক ব্যবহার-- সবই আছে।

ব্রীহি বীজ ব্যাঙ্কের সংগ্রহে বেশ কিছু অদ্বিতীয় দেশী জাত আছে, যেমন অভিনব রঙের ছোপ-নকশা ওয়ালা জাত কিম্বা ধানের খোসায় ডানার মত পরিবর্ধিত অংশ থাকা জাত। এদের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য সম্ভবত দুই-দানার 'যুগল' আর তিন-দানার 'সতীন' ধান। এই বৈশিষ্ট্যগুলো গবেষণাপত্রে প্রকাশিত [Deb 2005; Deb and Bhattacharya 2009][ঙ] ও ব্রীহির নামে কপিরাইটও করা হয়েছে, ভারতীয় চাষীদের মেধাস্বত্ত্ব সুরক্ষিত রাখার জন্যে।

কিছু ধানের জাতের অভিনব নিরাময়ী গুণাবলী রয়েছে। যেমন মনে করা হয় কবিরাজশাল জাতটি গড়পড়তা প্রোটিন খাদ্য হজমে অক্ষম ব্যক্তিদের যথেষ্ট পুষ্টি জোগাতে সক্ষম। আমাদের গবেষণা দেখিয়েছে যে ধানটিতে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তনশীল স্টার্চ[৬] আছে, যার একটা ভগ্নাংশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিড (প্রোটিনের মূল গঠনগত একক) উৎপন্ন করে। কেলাস ও ভূতমুড়ির লালচে স্টার্চ আদিবাসী মহিলাদের গর্ভাবস্থায় ও সন্তানজন্মের পরবর্তী সময়ে আবশ্যক পুষ্টি-উপাদান, কারণ আদিবাসীরা বিশ্বাস করেন যে এই চালগুলো অ্যানিমিয়া প্রতিরোধ করে। প্রাথমিক গবেষণায় এই ধানের দানায় প্রচুর পরিমাণে লোহা ও ফলিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে। স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতিতে দুধসর ও পরমাইশাল খুবই সম্মানের আসনে, কারণ এগুলো শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশের জন্যে ভাল বলে মনে করা হয়। যদিও এসমস্ত লোকায়ত বিশ্বাসকে খতিয়ে দেখার জন্যে কঠোর পরীক্ষামূলক গবেষণা প্রয়োজন, কিন্তু প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধারণায় এই সমস্ত লোকায়ত জ্ঞানকে কুসংস্কার বলে বাতিল করার প্রবণতা সর্বব্যপী, এমনকি পরীক্ষা করার আগেই। বলা বাহুল্য, এই বাতিল করা ততদিন অবধিই, যতদিন না কোন বহুজাতিক কর্পোরেশন ঠি গুণাবলীগুলোরই পেটেন্ট নিচ্ছে ।

সাবেকি চাষে নিযুক্ত চাষীরা কিছু ধানের জাত চাষ করেন স্থানীয় পরিবেশ ও মাটির সাথে তাদের বিশেষ অভিযোজনের জন্য। তেমনই রাঙী, কয়া, কেলাস আর নৈচি শুধুই বৃষ্টির জলে পুষ্ট শুকনো জমির ক্ষেতে বোনা হয়, যে জমিতে সেচের ব্যবস্থা নেই। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা বা দেরী এসব জাতের উৎপাদনের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করে না। বন্যাপ্রবণ জেলাগুলোতে, সাদা জাবড়া, লক্ষ্মীদীঘল, বন্যাশাল, জলকামিনী ও কুমড়োগোড় জাতে অত্যাশ্চর্য কাণ্ডের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি দেখা যায়, এদের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা জলস্তর ছাড়িয়ে ওঠার প্রবণতার জন্য। সর্বোচ্চ যে জলের গভীরতা লক্ষ্মীদীঘল সহ্য করতে পারে বলে মাপা হয়েছে তা ছয় মিটার। গেটু, মাতলা ও তালমুগুর হাজার ভাগে তিরিশ ভাগ অবধি নুন সহ্য করতে পারে, যেখানে হর্মানোনা মাঝারি রকম নোনা-সহনশীল। কোন আধুনিক ধানের জাত এইসমস্ত প্রান্তিক পরিবেশগত অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে না। প্রায়শই মেপে দেখা হয়েছে যে প্রান্তিক পরিবেশে সাবেকি ধানের জাতরা আধুনিক জাতেদের থেকে বেশী উৎপাদনে সক্ষম [Cleveland et al 2000]।

চাষিদের নির্বাচিত ফসলের জাতগুলো যে শুধু স্থানীয় মাটি ও জলবায়ুর জন্যে অভিযোজিত তাইই নয়, এগুলো রকমারি স্থানীয় এমনকি কৃষ্টিগত পছন্দ-অপছন্দের সাথেও খাপ খাইয়ে তৈরি। বহু স্থানীয় দেশি, সাবেকি ধানে শত্রুপোকা ও বীজাণুর বিরুদ্ধে লক্ষণীয় মাত্রায় প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। কালোনুনিয়া, কার্ত্তিকশাল ও তুলসীমঞ্জরী ধসা[৭] রোগ প্রতিরোধে সক্ষম, বিষ্ণুভোগ ও রানীকাজল ব্যাক্টেরিয়াঘটিত ঝলসা[৮] রোগ প্রতিরোধ করতে পারে বলে জানা আছে [Singh 1989]। গৌরনিতাই, যশুয়া ও শাটিয়া চুঙ্গি পোকার (*Nymphula depunctalis*) আক্রমণ ঠেকাতে সক্ষম বলে মনে হয়। খুদিখাসা, লোহাগোড়া, মালাবতী, সাদা ঢেপা ও সিঁদুরমুখী ধানে মাজরা পোকার (*Tryporyza* spp.) আক্রমণ দেখা যায় না বললেই চলে।

চাষীদের কৃষিপদ্ধতি ক্ষেতের খাদ্য-খাদকচক্র-মিথস্ক্রিয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার আরও একটা ফল হিসেবে এসেছে কিছু বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন, যেমন লম্বা শুঁয়াওয়ালা কিম্বা খাড়া সর্বোচ্চ পাতাওয়ালা ধানের জাতের বাছাই। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের শুকনো লালমাটির এলাকার চাষীদের পক্ষপাত দেখা যায় লম্বা ও শক্ত শুঁয়ার প্রতি, যাতে গরুছাগলে ফসল খেতে না পারে [Deb 2005]। বহু এলাকায় চাষীদের পছন্দ এমন ধানগাছ যাদের সর্বোচ্চ পাতা লম্বা ও খাড়া, যাতে বুলবুল বা মুনিয়া পাখীরা ধানের শীষ খেয়ে নিতে না পারে।

নানান ধানের জাত চাষ করা হয় তাদের বিশেষ গন্ধ, রঙ বা স্বাদের জন্যে। এদের মধ্যে কিছু খৈ বানাতে ব্যবহার হয়, কিছু মুড়ি বানাতে, আবার কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানে সুগন্ধি চালের পায়েস বা পিঠের মত মিষ্টান্ন বানাতে। ক্ষেতের ইকোসিস্টেমের জটিলতা বা স্থানীয় খাদ্যসংস্কৃতির বৈচিত্র্য, কোনটাই কৃষিতাত্ত্বিক আধুনিকীকরণের নজরে পড়ে না। অতএব আধুনিক কৃষি গবেষণা ফসলের জিনগত বৈচিত্র্য বিপুলভাবে কমিয়েছে ও সব মহাদেশেই খাদ্যসংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্যকে সমসত্ত্বীকরণ করে কমিয়ে এনেছে।

সুস্থায়ী কৃষি ও ফসলের জিনবৈচিত্র্য

ফসলের জিনবৈচিত্র্যের যে ভাণ্ডার আমাদের পূর্বপুরুষরা বহু সহস্রাব্দ ধরে গড়ে তুলেছেন [Doebley 2006], স্থানীয় জলবায়ু, মাটির রাসায়নিক প্রকৃতি ও অন্যান্য জীবজাগতিক প্রভাবের স্টোকাস্টিক[৯] পরিবর্তনের উলটোদিকে সেটাই আমাদের সেরা বাজি। ধান ক্ষেতে সাবেকি জাতগুলোর মিশ্রণ ফিরিয়ে আনাই সুস্থায়ী কৃষির চাবিকাঠি। শত্রুপোকা, রোগের আক্রমণ ও জলবায়ুর খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে জিনভান্ডারের ব্যপ্তি যেন 'স্বনিহিত বীমা' ('built-in insurance' [Harlaan 1992])।

শস্যের সাবেকি জাতগুলো সুস্থায়ী কৃষির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কারণ তাদের ফলনের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা বেশিরভাগ আধুনিক জাতের চাইতে বেশি। পর্যাপ্ত পরিমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণ এটাই দেখায় যে যখনই সেচের জলের বা সারের স্বল্পতা দেখা যায় - খরা, সামাজিক সমস্যা কিম্বা সরবরাহ ব্যবস্থার সাময়িক গোলযোগে, আধুনিক জাতগুলোর ফলন ঘাটতি অনেক বেশি হয় ও অনেক বেশি অঞ্চল জুড়ে এই ঘাটতি দেখা যায়[১০] [Cleveland et al. 1994]। চাষের আদর্শ পরিস্থিতিতে, কিছু সাবেকি জাতের গড় ফলন উচ্চফলনশীল জাতদের থেকে কম হতে পারে, কিন্তু যে প্রান্তিক পরিবেশের জন্য ঐ দেশি জাতটা বিশেষভাবে অভিযোজিত, সেখানে তাদের ফলন উচ্চফলনশীল জাতের থেকে অনেকটাই বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের[চ] এক প্রত্যন্ত কোণায় অবস্থিত বসুধা খামারে এই সমস্ত তফাৎ সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় এইটি একমাত্র খামার যেখানে ৬০০র[ছ] ও বেশি দেশি ধানের জাত প্রতি বছর চাষ করা হয় বীজ উৎপাদনের জন্য। এই সমস্ত জাতই কোন কৃষিরাসায়নিকের ব্যবহার ছাড়া এবং বিনা সেচে চাষ হয়। একই খামারে তৈলবীজ, সব্জি ও ডাল মিলিয়ে আরও ২০ টিরও বেশি অন্যান্য ফসল চাষ হয় প্রতি বছর। একজন আধুনিক "বিজ্ঞান প্রশিক্ষিত" চাষী কিম্বা পেশাদার কৃষিবিদ বিশ্বাসই করে উঠতে পারবেন না যে বিগত আট বছরে[জ], বসুধার শস্যগুলোর এতগুলো জাতের একটিরও কোনরকম কীটনাশক, এমনকি জৈব কীটনাশকও দরকার হয়নি শত্রুপোকা আর রোগের আক্রমণ সামলাতে। রোগ ও পোকার সংক্রমণ এড়াতে বিভিন্ন জাতের মিশ্র চাষের সুবিধা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক লেখাপত্রে পর্যাপ্ত লেখালিখি হয়েছে [Winterer et al. 1994; Wolfe 2000; Leung et al. 2003]। এ সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি আসলে লুকিয়ে আছে লোকায়ত ইকোলজির জ্ঞানে - **জীববৈচিত্র্য ইকোসিস্টেমের স্থায়িত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়**। আধুনিক ইকোলজির গবেষণা [Folke et al. 2004; Tilman et al. 2006; Allesina and Pascual 2008] এই জ্ঞানকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

ফসলবৈচিত্র্য যদি সুস্থায়ী কৃষির হার্ডওয়্যার হয়ে থাকে, সফটওয়্যার তবে জীববৈচিত্র্য বাড়াবার কৃষি-প্রকৌশলগুলো। কৃষি-প্রকৌশলগুলো হচ্ছে কৃষির 'প্রোগ্রাম' যা ফসলের উপযুক্ত পরিমাণ জিনগত ও প্রজাতিগত বৈচিত্র্যের হার্ডওয়্যারে সফলভাবে 'চালানো' সম্ভব। আবার উপযুক্ত হার্ডওয়্যার ছাড়া ইকোলজিভিত্তিক কৃষির সফটওয়্যারে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ খামারের জীববৈচিত্র্যই সেই পরীক্ষামূলক ভিত্তিভূমি যার উপর দাঁড়িয়ে এই টেকনিকগুলো বিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। একাধিক ফসল বোনা, নানা জাতের মিশ্র কৃষির ব্যবহার, জমিতে একাধিক টুকরো টুকরো ভিন্ন ধরণের আবাসস্থল তৈরী আর শত্রুপোকাদের স্বাভাবিক শত্রুদের সংখ্যা বাড়তে সাহায্য করা, এগুলো কৃষি-ইকোসিস্টেমের জটিলতা বাড়ানোর সবচেয়ে নিশ্চিত উপায়। জিনগত ও প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বেশি মানে ইকোসিস্টেমের বেশি জটিলতা, যা আবার বাড়িয়ে তোলে ইকোসিস্টেমের স্থিতিস্থাপকতা - মানে আকস্মিক পরিবেশগত আপদ যেমন শত্রুপোকার আক্রমণ বা রোগের মড়ক বা খরা ইত্যাদি, এসবের পরে ইকোসিস্টেমের পূর্বতন প্রজাতি-সমাহার ও অবয়ব বা প্রতিন্যাসে ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা।

ক্ষেতে জীববৈচিত্র্যের ইকোলজিগত কার্যকারিতা

খাদ্য সুরক্ষা ও উৎপাদনের স্তরে স্থায়িত্ব কৃষি-ইকোসিস্টেমের স্থিতিস্থাপকতার ফসল, যা শুধুমাত্র প্রজাতিগত ও ফসলের জিনগত, দুই স্তরেই বৈচিত্র্যের মাধ্যমেই টিকিয়ে রাখা সম্ভব। বিভিন্ন জাতের মিশ্র কৃষি রোগ ও শত্রুপোকার আক্রমণ কমানোর প্রামাণ্য পদ্ধতি। সঙ্গী ফসল হিসেবে অড়হর[১১], কাবুলী ছোলা[১২], চুকাই ঢেঁড়স[১৩], নানা রকম কন্দ[১৪], ঢোল কলমি[১৫] আর আলের ধারের ঝোপ[১৬] বহু উদ্ভিজ্জভোজী কীটপতঙ্গের বিকল্প আস্তানা হিসেবে কাজ করে ও ধানের

শত্রুপোকার আক্রমণের চাপ কমায়। এরা মাটিকে জরুরী পুষ্টিউপাদানও সরবরাহ করে, আবার অড়হরের মত সহযোগী ফসলের পাতা কিছু বিশেষ ঘাস যেমন মুথাঘাসের[১৭] বাড় কমাতে পারে।

জমিতে মাংসাশী পাখি ও সরীসৃপ ডেকে এনে (যদিনা রাসায়নিক বিষ ও কীটনাশকের ব্যবহারে তারা ইতিমধ্যেই এলাকাছাড়া হয়ে গিয়ে থাকে) শত্রুপোকা ও শামুক-গেঁড়ি-গুগলির উপদ্রব কমানো, এমনকি নির্মূল করে ফেলাও সম্ভব। ক্ষেতে বড় গাছ না থাকলে, ইংরেজি 'T' আকৃতির বাঁশের দাঁড় বানিয়ে কিম্বা মরা গাছের শাখাসমেত কাণ্ড জমিতে পুঁতে রাখলেও ফিঙে[১৮], বাঁশপাতি[১৯], প্যাঁচা, রাতচরা[২০] সমেত নানারকম মাংসাশী পাখি সেগুলোয় এসে বসে। জমিতে মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা ছেড়ে রাখলে কিম্বা ছোট ছোট জলভরা গর্ত থাকলে রকমারি ইকোসিস্টেম তৈরি হয়, ফলত জীববৈচিত্র্য বাড়ে। মোহনচূড়া[২১], গাইবক[২২], শালিক[২৩] আর বড় কুবো[২৪] পাখিরা জমিতে পোকামাকড়ের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে খুবই পছন্দ করে।

মাটির পুষ্টিউপাদান হারানো ঠেকাতে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার ব্যবস্থাও ভীষণ জরুরী। ভিজে খড়, লতাপাতা দিয়ে জমি ঢেকে দিলে যে স্যাঁতসেঁতে ভাব সৃষ্টি হয় তাতে শস্য উদ্ভিদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিন সক্রিয় হয়ে ওঠে ও দুয়ের সম্মিলিত ঐক্যতানে গাছের বুড়িয়ে যাওয়া দেরীতে হয় ও রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে [Kumar et. al. 2004][২৫]। ফসলের গোড়ার দিকের মাটি খোলা না রাখতে ফসলের উপরে বিছানো পাতা[২৬] আর মাটি ন্যাড়া না রাখার জন্যে ফাঁকা জমিতে বোনা ছাউনি-ফসলের[২৭] সম্মিলিত ব্যবহার বাঁচিয়ে রাখে মাটির ইকোসিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোকে - অণুজীব, কেঁচো, পিঁপড়ে, গুবরে পোকা ও তাদের শূককীট, কেন্নো, তেঁতুলবিছে, জোনাকি, সিউডোস্কর্পিওন[২৮] ও ঘুরঘুরে পোকা[২৯] - যেগুলো সবই মাটির পুষ্টিউপাদানগুলোর পুনরুজ্জীবন চক্রে ভূমিকা পালন করে।

কৃষির সুস্থায়িত্ব দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনশীলতার প্রশ্ন, স্বল্পমেয়াদে ফলন বাড়ানোর নয়। ইকোলজিভিত্তিক কৃষি, যা ক্ষেতের ইকোসিস্টেমগুলোকে বোঝার চেষ্টা করে ও ইকোলজির নীতিগুলোকে চাষে প্রয়োগ করে, তাইই আধুনিক কৃষির ভবিষ্যৎ। গত পঞ্চাশ বছরে কৃষিতে শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় ঘটে চলা ভুলগুলো শুধরোতে গেলে বিগত শতকগুলোর কৃষিসংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞান ও প্রাচীন অনামা চাষী-বিজ্ঞানীদের বিপুল সাফল্যের ভাঁড়ারকে খতিয়ে দেখতে হবে। কৃষি-ইকোসিস্টেমের অঙ্গগুলোর মধ্যে পুনঃসংযোগসাধন করতে আমরা বাধ্য। কৃষিউৎপাদনের সমস্যা, যা আসলে তৈরি হয়েছে কৃষি-ইকোসিস্টেমের খণ্ডিত ও খর্বিত হওয়ার কারণে, তা শুধু সেই সাবেকি কৃষিপদ্ধতির জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ জটিলতা ফিরিয়ে এনেই সমাধান করা সম্ভব, প্রযুক্তিগত টোটকা দিয়ে সেটাকে আরও সরলীকরণ করে নয়।

তথ্যসূত্র

- Allesina S and Pascual M (2008). Network structure, predator-prey modules, and stability in large food webs. Theoretical Ecology 1(1):55-64.
- Basu, P (2007). Microscopes made from bamboo bring biology into focus. Nature Medicine 13(10): 1128. http://www.nature.com/nm/journal/v13/n10/pdf/nm1007-1128a.pdf.
- Challinor A, Slingo J, Turner A and Wheeler T (2006). Indian Monsoon: Contribution to the Stern Review. University of Reading. www.hm-treasury.gov.uk/d/Challinor_et_al.pdf.
- Chameides B (2009). Monsoon fails, India suffers. The Green Grok. Nicholas School of the Environment at Duke University. www.nicholas.duke.edu/thegreengrok/monsoon_india.
- Cleveland DA, Soleri D and Smith SE (1994). Do folk crop varieties have a role in sustainable agriculture? BioScience 44(11): 740–751.
- Cleveland DA, Soleri D and Smith SE (2000). A biological framework for understanding farmers' plant breeding. Economic Botany 54(3): 377–394.
- Deb D (2005). Seeds of Tradition, Seeds of Future: Folk Rice Varieties from east India. Research Foundation for Science Technology & Ecology. New Delhi.
- Deb D and Bhattacharya D (2009). Two unique landraces from West Bengal. Seed Research, Vol. 37(1&2): 162-165.
- Doebley J (2006). Unfallen grains: how ancient farmers turned weeds into crops. Science 312(5778): 1318–1319.
- FAI (2008). Fertiliser Statistics, Year 2007-2008. Fertilizer Association of India. New Delhi. http://www.faidelhi.org/
- Flinn JC, De Dutta SK and Labadan E (1982). An analysis of long term rice yields in a wetland soil. Field Crops Research 7(3): 201–216.
- Folke C, Carpenter S, Walker B, Scheffer M, Elmqvist T, Gunderson L and Holling CS (2004). Regime shifts, resilience and biodiversity in ecosystem management. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 35: 557–581.
- Government of India (2007). Report of the Expert Group on Agricultural Indebtedness. Ministry of Agriculture. New Delhi. http://www.igidr.ac.in/pdf/publication/PP-059.pdf
- Harlan JR (1992) Crops and Man (2nd edition). , p. 148. American Society of Agronomy, Inc and Crop Science Society of America, Inc., Madison, WI.
- Kumar V, Mills DJ, Anderson JD and Mattoo AK (2004). An alternative agriculture system is defined by a distinct expression profile of select gene transcripts and proteins. PNAS 101(29): 10535–10540.
- Leung H, Zhu Y, Revilla-Molina I, Fan JX, Chen H, Pangga I, Vera Cruz C and Mew TW (2003). Using genetic diversity to achieve sustainable rice disease management. Plant Disease 87(10): 1156–1169.
- Pingali PI (1994). Technological prospects for reversing the declining trend in Asia's rice productivity. In: Agricultural Technology: Policy Issues for the International Community (Anderson JR, ed), pp. 384–401. CAB International.
- Posani B (2009). Crisis in the Countryside: Farmer suicides and the political economy of agrarian distress in India. DSI Working Paper No. 09-95. Development Studies Institute, London School of Economics and Political Science. Lo http://www.lse.ac.uk/collections/DESTIN/pdf/WP95.pdf
- Richharia RH and Govindasamy S (1990). Rices of India. Academy of Development Science. Karjat.Note: The only reliable data are given in Richharia and Govindasamy (1990), who estimated that about 200,000 varieties existed in India until the

advent of the Green Revolution. Assuming many of these folk varieties were synonymous, an estimated 110,000 varieties were in cultivation. Such astounding figures win credibility from the fact that Dr. Richharia collected 22,000 folk varieties (currently in custody of Raipur University) from Chhattisgarh alone – one of the 28 States of India. The IRRI gene bank preserves 86,330 accessions from India [FAO (2003) Genetic diversity in rice. In: Sustainable rice production for food security. International Rice Commission/ FAO. Rome. (web publication) URL: http://www.fao.org/docrep/006/y4751e/y4751e0b.htm#TopOfPage]
- Singh RN (1989). Reaction of indigenous rice germplasm to bacterial blight. National Academy of Science Letters 12: 231-232.
- Tilman D, Reich PB and Knops JMH (2006). Biodiversity and ecosystem stability in a decade-long grassland experiment. Nature 441: 629-632.
- Winterer J, Klepetka B, Banks J and Kareiva P (1994). Strategies for minimizing the vulnerability of rice to pest epidemics. In: Rice Pest Science and Management. (Teng PS, Heong KL and Moody K, eds.), pp. 53–70. International Rice Research Institute, Manila.
- Wolfe MS (2000). Crop strength through diversity. Nature 406: 681–682.

ভাষান্তরকারীর টীকাঃ

- ১) "primitive" - "আদিম"
- ২) sustainable agriculture - সুস্থায়ী কৃষি
- ৩) landraces -- আমরা দেশী বা সাবেকি জাত বলব।
- ৪) awn - শুঁয়া
- ৫) panicle density - শীষে দানার সংখ্যা
- ৬) labile starch - পরিবর্তনশীল স্টার্চ
- ৭) blast - ধসা রোগ
- ৮) bacterial blight - ব্যাকটিরিয়াঘটিত ঝলসা রোগ
- ৯) stochastic -- কোন বিশেষ কারণ বা অভিমুখ ছাড়াই সাধারণভাবে যে র‍্যান্ডম পরিবর্তন হয়ে থাকে।
- ১০) “modern crops typically show a reduction in yield that is greater and covers wider areas, compared with folk varieties” (Cleveland et al. 1994).
- ১১) Pigeon Pea - অড়হর
- ১২) Chickpea - কাবুলী ছোলা
- ১৩) Roselle -- মূল প্রবন্ধে rozelle আছে, সম্ভবত ছাপার ভুল কিম্বা বানান বিভ্রাটে। এই গাছটার বহু নাম আছে, এমনকি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশেও সব জায়গায় একই নামে ডাকা হয় এমন নয়। চুকাই বা টক ঢেঁড়শ নামে সবচেয়ে বেশি জায়গায় ডাকা হয় সম্ভবত।
- ১৪) Yam - কন্দ
- ১৫) Ipomea fistulosa - ঢোলকলমি
- ১৬) hedge bushes - আলের ধারের ঝোপ
- ১৭) Cyperus rotundus - মুথা ঘাস
- ১৮) drongo - ফিঙে
- ১৯) bee-eater - বাঁশপাতি
- ২০) nightjar - রাতচরা
- ২১) hoopoe - মোহনচূড়া
- ২২) cattle egret - গাইবক বা গোবক, একধরণের বক
- ২৩) myna - শালিক
- ২৪) crow pheasant - বড় কুবো
- ২৫) মূল প্রবন্ধে বাক্য: The moisturizing effect of mulching triggers certain key genes that synergistically operate to delay crop senescence and reduce disease susceptibility (Kumar et al. 2004).
- ২৬) green mulch - ফসলের গোড়ার দিকের মাটি খোলা না রাখতে ফসলের উপরে বিছানো আচ্ছাদন। সাবেকি চাষে সবুজ বা শুকনো পাতা ব্যবহার হয়। আধুনিক চাষীরা অনেকে প্লাস্টিক চাদর ব্যবহার করেন।
- ২৭) cover crop - ছাউনি-ফসল
- ২৮) pseudoscorpion - একরকম ছোট মাটির পোকা, যা অনেকটা কাঁকড়াবিছের মত দেখতে কিন্তু আসলে কাঁকড়াবিছে নয়।
- ২৯) thrips - ঘুরঘুরে পোকা

ভাষান্তরকারীর সাধারণ টীকা

- ক - ২০০৯ সালের সাপেক্ষে
- খ - ২০২০ সালে এই সংখ্যা ১৪৪০।
- গ - ২০০৯ সালে
- ঘ - ২০২০ সালে এই সংখ্যা ৪০০০ এর বেশি

- ঙ - Deb and Bhattacharya 2009 প্রবন্ধটির প্রকাশকাল, এই প্রবন্ধের মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি প্রকাশের পরে, তাই মূল প্রবন্ধে এই তথ্যসূত্রটি অনুপস্থিত।
- চ - ২০১০-এর পর থেকে ওড়িশার নিয়মগিরি পাহাড়ের কোলে
- ছ - ২০২০ সালে এই সংখ্যা ১৪৪০।
- জ- মূল প্রবন্ধে বিগত আট বছর লেখা হয়েছিল ২০০৯ সালের সাপেক্ষে। আজ ২০২০ সালে দাঁড়িয়ে এইটা বিগত কুড়ি বছরে জন্যেও সমানভাবে সত্যি। জাতের সংখ্যা ৬১০ থেকে বেড়ে ১৪৪০ হয়েছে, এমনকি বসুধা খামারের জায়গা বদল হয়েছে, তাতেও এই বাক্য আজও একইভাবে সত্যি।

- সময় সংক্রান্ত সমস্ত শব্দই, যেমন 'এ বছর' বা 'গত চোদ্দ বছরে' ইত্যাদি ইংরেজি ২০০৯ সালের স্বাপেক্ষে।
- লেখার মধ্যের সমস্ত পাদটীকা মূল লেখক ডঃ দেবল দেব এই অনুবাদ পরিমার্জনের সময় সরাসরি যোগ করেছেন। মূল প্রবন্ধের তথ্যগুলি যেহেতু ২০০৯ সালের, আজকে ২০২০ সালে সেগুলো পাল্টেছে নানাভাবে। বেশিরভাগ পাদটীকাই সেই সংক্রান্ত।
- folk rice variety, folk crop variety ইত্যাদি সমস্ত শব্দবন্ধে folk এর ভাষান্তরে অনেকেক্ষেত্রেই দেশী বা সাবেকি ব্যবহার করা হয়েছে। লোকায়ত ধানের জাত, লোকায়ত ফসল আপাতদৃষ্টিতে তুলনামূলকভাবে বেশী মূলানুগ ভাষান্তর হলেও দেশী বা সাবেকি ব্যবহারে অর্থগ্রহণের সুবিধে হবে বলে ভাষান্তরকারীর অভিমত।
- variety র বাংলা করা হয়েছে জাত, যেহেতু সেইটাই বহুল প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ। ‘উপপ্রজাতি’ উপযুক্ততর বাংলা প্রতিশব্দ হত কিনা এই বিতর্ক নিয়ে মাথা ঘামানোর থেকে আপামর বাঙালীর কাছে সহজবোধ্য হওয়ার যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে প্রায় সর্বত্র।
- একই ভাবে অনুবাদকে মূলানুগ রাখা ও আপামর বাঙ্গালীর পড়ে অর্থগ্রহণ, এই দুইয়ের সংঘাত ঘটার অবকাশ ঘটলে অর্থগ্রহণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজি শব্দের নির্দিষ্ট প্রতিশব্দ থাকলেও ব্যবহার করা হয়নি বা ইংরেজি বাক্যগঠনের কাঠামো বাংলায় অর্থগ্রহনের সুবিধা ও শ্রুতিমধুরতার কারণে পালটানো হয়েছে।
- ex situ conservation ও in situ conservation দুটি টেকনিক্যাল শব্দ, যাদের কোন প্রকৃত বাংলা পরিভাষা অনুপস্থিত। চাষীর জমিতে বছর বছর চাষ করে কোন প্রজাতির বীজধারা (lineage) সংরক্ষণ করা যায়, আবার বীজকে ঠাণ্ডাঘরে সঞ্চিতও রাখা যায়। এদেরকেই যথাক্রমে in situ ও ex situ conservation বলা হয়। এদের ভাষান্তরে ক্ষেতস্থ ও ক্ষেত-বহির্ভূত করা হয়েছে, সঙ্গে বাংলা হরফে ইন সিটু ও এক্স সিটু লিখেও রাখা হয়েছে।
- sustainable agriculture ও sustainability র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে সুস্থায়ী কৃষি ও সুস্থায়িত্ব ব্যবহার করা হয়েছে। ecosystem ও ecology এই শব্দদুটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে যথাক্রমে বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা ব্যবহার হয়। কিন্তু প্রচলিত পরিভাষা হলেও অর্থগ্রহণের জন্য সেগুলোর থেকে বেশি সুবিধাজনক নয় বলে তার বদলে যথাক্রমে ইকোসিস্টেম ও ইকোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। agroecology ও agroecosystem এর প্রতিশব্দ হিসেবে যথাক্রমে ইকোলজিভিত্তিক কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষি-ইকোসিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। Ecological agriculture এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে ইকোলজিভিত্তিক কৃষি।

লেখক সেন্টার ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ, ইন্ডিয়া-র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি। যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।

মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি বার পঠিত